পারসোনাল কমপিউটার পরিচিতি

কমপিউটার হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা নির্দিষ্ট নিয়মে ডাটা গ্রহণ এবং নির্দেশ (instruction) অনুযায়ী তা প্রক্রিয়াকরণ (process) করতে পারে। প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফল নির্দিষ্ট নিয়মে তথ্য (information) আকারে সরবরাহ করে বা সিগন্যালের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য কোন মেশিন পরিচালনা বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ হতে পারে। বর্তমানে সচরাচর আমরা যে কমপিউটার দেখি তার যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয় ইলেকট্রন (অর্থাৎ বিদ্যুৎ) প্রবাহের সাহায্যে সংখ্যার (Digit) মাধ্যমে ডাটাকে প্রক্রিয়া করে। এ জন্য এদের ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার বলা হয়।

মাইক্রোকমপিউটার বা পারসোনাল কমপিউটার (PC) হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত সবচেয়ে ছোট ধরণের বহুল ব্যবহৃত কমপিউটার। একটি সম্পূর্ণ পারসোনাল কমপিউটার সিস্টেমে রয়েছে মাইক্রোপ্রসেসর এবং আনুষঙ্গিক কিছু যন্ত্রাংশ, প্রাইমারী স্মৃতি ভাণ্ডার (storage), ইনপুট/আউটপুট সার্কিটযুক্ত এক বা একাধিক সার্কিট বোর্ড, ইনপুট/আউটপুট এবং সেকেণ্ডারী ষ্টোরেজ ডিভাইসসমূহ। এই সমস্ত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশগুলোকে এবং কমপিউটারের যা কিছু ধরা বা ছোঁয়া যায় তাদেরকে কমপিউটারের হার্ডওয়্যার (hardware) বলা হয়। আর কমপিউটার পরিচালনা বা তাকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য ব্যবহৃত সকল প্রোগ্রামকে (যা একগুচ্ছ ধারাবাহিক নির্দেশ) সফটওয়্যার বলে।

নীচে পারসোনাল কমপিউটারের প্রধান প্রধান হার্ডওয়্যারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

(১) ইনপুট ডিভাইস ঃ -

মাইক্রোকমপিউটারে ডাটা বা প্রোগ্রাম প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রথমে ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য অক্ষর, সংখ্যা বা নির্দেশকে কমপিউটারের স্মৃতিতে পৌঁছে দেয়া হয় যা ইনপুট নামে পরিচিত। কমপিউটার এ তথ্য বা নির্দেশকে তার বোধগম্য ভাষা বাইনারী কোডে পরিবর্তিত করে নেয়। বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাকে কেবল মাত্র দুটি রাশি বা ডিজিট ০,১ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ দুটি ডিজিটের এক একটিকে বিট (Bit) বলে। Binary Digit এর সংক্ষিপ্ত। (Bit) সাধারণতঃ আটটি বিটের একত্রিত ইউনিটকে বাইট (Byte) বলা হয়। আমরা গণিতে সচরাচর যে পদ্ধতি ব্যবহার করি তাকে দশমিক পদ্ধতি বলে। এতে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশটি ডিজিট থাকে। দশমিক পদ্ধতিতে যেমন ডিজিটের অবস্থান বাঁয়ে ১ ঘর সরালে ঐ ডিজিটের ১০ দিয়ে গুণ করা বুঝায়, তেমনি বাইনারী সিষ্টেমে বাঁ দিকে এক ঘর সরানো মানে ২ দিয়ে গুণ করা। এভাবে বাইনারী নম্বর ১০ কে দশমিক সংখ্যায় দুই, আবার ১০১, ১১০, ও ১১১১ কে দশমিক সংখ্যায় যথাক্রমে বুঝায় পাঁচ, ছয় এবং পনের। ১৮৫৪ সালে জর্জ বুলি নামে একজন ইংরেজ গণিতজ্ঞ এই বাইনারী পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বাইনারি কোডে পরিবর্তন করার পর তা ডিজিটাল ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে

একটি পারসোনাল কমপিউটার

মোঃ আবদুল কাদের
এম,এস-সি,
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত ছোটদের বিজ্ঞান মাসিক 'টরে টক্কা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।
বর্তমানে একটি কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত।

প্রাইমারী স্মৃতি ভাণ্ডারে পাঠানো হয়। সেখানে থেকে এগুলো প্রয়োজন মত কমপিউটারের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হয়। ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে চালকের সাথে কমপিউটারের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইনপুট ডিভাইসসমূহের মধ্যে কী-বোর্ড, মাউস, জয়ষ্টিক অপটিক্যাল স্ক্যানার ও লাইটপেন উল্লেখযোগ্য। ফ্লপি ডিস্ক এবং হার্ডডিস্কও কমপিউটারে অনেক সময় ইনপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে।

কী-বোর্ডঃ- কমপিউটারে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে কী-বোর্ড। টাইপ রাইটারের প্রথম অর্ধাংশের মত দেখতে এবং কী গুলো প্রায় একই রকমে সাজানো। এই কী-বোর্ডের চাবিগুলো বিশেষ ধরণের ইলেকট্রনিক সুইচের কাজ করে। প্রতিটি কী চাপলে একটি বিশেষ ক্যারেকটার বা ষ্টেটমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট একসারি ডিজিটাল বৈদ্যুতিক স্পন্দন তৈরী করে প্রাইমারী ষ্টোরেজে পাঠিয়ে দেয়। ক্যারেকটার (character) হচ্ছে যে কোন একটি বর্ণ, রাশি, যতি চিহ্ন বা বিশেষ চিহ্ন যেমন- #, &, > ইত্যাদি। প্রোগ্রাম লিখিত যে কোন নির্দেশকে ষ্টেটমেন্ট বলে।

আধুনিক কী-বোর্ডে বর্ণমালার কী-সমূহ এবং স্পেসবার ছাড়াও সচরাচর নিম্নলিখিত কীসমূহ থাকে ঃ-

*** নিউমেরিক কী সমূহ ঃ -** এই কী সমূহে চাপ দিয়ে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত রাশির ডিজিটাল বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো প্রধান কী-বোর্ডের ডানদিকে, কী-প্যাড হিসাবে থাকে। এবং এদেরকে কোন দীর্ঘ গাণিতিক রাশিমালা বা ডাটা এন্ট্রির কাজে সহজে ব্যবহার করা হয়।

*** কার্সর নিয়ন্ত্রক কী ঃ -** মনিটরের যে জায়গায় কমপিউটার নতুন ক্যারেক্টার ফুটিয়ে তুলবে অর্থাৎ যে জায়গায় নতুন এন্ট্রি হবে সেই স্থান চিহ্নিতকারী ক্রমাগত জ্বলতে নিভতে থাকা ছোট আলোক চিহ্নকে কার্সর (cursor) বলে। কার্সর নিয়ন্ত্রক কী চেপে কার্সরকে ইচ্ছে মত যে কোন দিকে সরানো যায়।

*** ফাংশন কী ঃ -** যে সমস্ত কী চেপে বিশেষ বিশেষ ষ্টেটমেন্ট/নির্দেশ দেয়া যায়

*** ব্যাকস্পেস** (Backspace) **কী ঃ-** যে কী দিয়ে কার্সরের বাঁ দিকের লেখা মুছে ফেলা যায় বা কার্সরকে বাঁ দিকে নেয়া যায়।

*** এন্টার**(Enter) **বা রিটার্ণ** (Return) **কীঃ -** পরবর্তী প্যারাগ্রাফে যেতে বা কোন নির্দেশ কার্যকর করার আদেশ দিতে এই কী ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় একাধিক কী একসাথে বা পর পর চেপেও বিশেষ বিশেষ কাজের নির্দেশ দেয়া যায়।

মাউস (Mouse) :- ছোট্ট এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি কমপিউটারে সংযুক্ত থাকলে তা টেবিল বা যে কোন সমতল জায়গায় রেখে ইচ্ছেমত বিভিন্ন দিকে সরিয়ে কার্সরকে ইচ্ছেমত চালানো যায় বা স্ক্রীনে বর্ণিত কোন কাজ বেছে নিয়ে কমপিউটারকে কোন আদেশ দেওয়া যায়।

অপটিক্যাল স্ক্যানার (Optical Scanner) :- এটা ব্যবহার করে যে কোন মুদ্রিত অংশ বা ছবি ডিজিটাল সিগন্যালে পরিবর্তিত করে প্রাইমারী স্টোরেজে পাঠানো যায় এবং সেকেণ্ডারী স্টোরেজে ধারণ করে তা পরবর্তীতে ইচ্ছেমত পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে ব্যবহার করা যায়।

লাইট পেন (Light pen) :- এটা ব্যবহার করে স্পর্শের সাহায্যে কমপিউটারের মনিটরে দর্শনীয় অংশকে সহজে অল্প সময়ে ইচ্ছে মাফিক পরিবর্তন করা যায়।

(২) সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) :-

এই ইউনিটটি কমপিউটারের প্রধান অংশ। এতে একটি সার্কিট বোর্ড থাকে যাতে প্রধান মাইক্রো-প্রসেসর, অতিরিক্ত মাইক্রো-প্রসেসর (যেমন- ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইসের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী মাইক্রো-প্রসেসর), অন্যান্য সক্রিয় উপাদান ও চিপসমূহ, বাস বা হাইওয়ে নামক সংযোগ মাধ্যমের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কমপিউটারে কোন যন্ত্রাংশ থেকে অন্য যন্ত্রাংশে পরস্পরের মধ্যে বিদ্যুৎ সংকেত আদান প্রদানের মাধ্যমকে বাস বা হাইওয়ে বলে। এটি একগুচ্ছ তারের সমষ্টি বা কমপিউটারের চিপে অতি সুক্ষ সুপরিবাহী রেখাসমূহও হতে পারে। কমপিউটারে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ, নির্দেশ পালন এবং অন্যান্য সমুদয় অংশের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় এই সিপিইউ-এর মাধ্যমে। সিপিইউ তে তিনটি প্রধান অংশ আছে :-

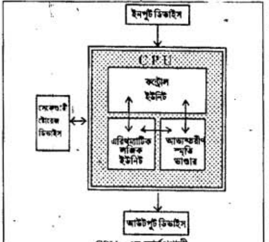

CPU -এর কার্যপ্রণালী

(ক) এরিথম্যাটিক লজিক ইউনিট (ALU) :-

কমপিউটারের সিপিইউ বা মাইক্রো প্রসেসরের এই অংশে গাণিতিক এবং যৌক্তিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়। স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে ডাটা এখানে আসে এবং তা সম্পূর্ণ প্রসেস না হওয়া পর্যন্ত বারবার স্মৃতি ভাণ্ডারে আসা যাওয়া করে। এই চক্রের সময় মাইক্রো প্রসেসরের কার্যাবলীকে কতগুলো ক্ষুদ্র কার্যক্রমে বা মাইক্রো অপারেশনে ভাগ করা যায়। এক একটি মৌলিক বা বেসিক অপারেশন সম্পূর্ণ হতে যে সময় লাগে তাকে 'মেশিন চক্র সময়' বলে। এই সময় সাধারণতঃ ন্যানো সেকেণ্ড (nano second = ১ সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ সময়) মাপা হয়। মাইক্রোপ্রসেসরে মধ্যে অবস্থিত টাইমিং সার্কিটের মাধ্যমে ঘটিত মেশিন চক্রের ফ্রিকোয়েন্সীকে (অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে চক্রের হারকে) মেগাহার্টজে (Mega Hertz বা MHz) প্রকাশ করা হয়। মেগাহার্টজ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে যত মিলিয়ন মেশিন চক্র সমাধা হয় তা। যেমন ১০ মেগাহার্টজ বলতে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মিলিয়ন চক্র সমাধা হওয়া বুঝায়। আধুনিক পারসোনাল কমপিউটার সাধাণতঃ ১০ মেগাহার্টজ থেকে ৩৩ মেগাহার্টজ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর থেকে বুঝা যায় আধুনিক কমপিউটার কত দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে।

ALU ডাটাকে চলমান এবং অন্যত্র স্থানান্তরের জন্যও দায়ী। এই অংশ 'এবং' 'অথবা' 'না' ইত্যাদি সাধারণ যৌক্তিক কাজসমূহ করতে পারে। এই ইউনিটের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা হয়, কোন সংখ্যা পজিটিভ বা নেগেটিভ কিনা বা সংখ্যাটি শূন্য কিনা, বা একটি সংখ্যা অন্যটি থেকে ছোট, বড় বা সমান কিনা তা যাচাই হয়। আর এ থেকেই প্রক্রিয়াকরণের অনেক শর্ত যাচাই করে কমপিউটার সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে বা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারে।

(খ) স্টোরেজ বা স্মৃতি ভাণ্ডার (MMU) :-

কমপিউটার তার স্মৃতি ভাণ্ডারে ডাটা বা নির্দেশ জমা রাখতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজন মতো তা নিয়ে প্রসেস করতে পারে। প্রসেস করার পূর্বে স্মৃতি ভাণ্ডারে জমা রাখার কাজটি সিপিইউ তে অবস্থিত "প্রধান মেমোরি বা প্রাইমারী স্টোরেজ ইউনিটে" সম্পাদিত হয়। র‍্যাম ও রম নামক চিপ যা সিপিইউ বা প্রধান অংশের সাথে সার্কিট বোর্ডে থাকে তা এই প্রাইমারী স্মৃতি ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে।

RAM (Random Access Memory) প্রক্রিয়াকরণের সময় ডাটা বা নির্দেশকে সাময়িকভাবে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে সংগৃহীত প্রতিটি তথ্য কম্যাণ্ডের মাধ্যমে সরাসরি পড়া (Read) যায় বা পুনঃসংরক্ষণ (Write) করা যায়। এজন্য একে (read/write) মেমোরিও বলা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে এর মধ্যে ধারণকৃত সকল স্মৃতি একেবারে সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়।

এ ছাড়া ক্যাশ মেমোরি (Cache memory) নামে একটি অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন স্মৃতি ধারণ যন্ত্রাংশ (component) আছে। এটা সিপিইউ-এর কার্যাবলীর সহযোগী হিসাবে সিপিইউ -এর ভিতর অথবা বাইরেও থাকতে পারে। প্রসেসিং -এর সময় এতে প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ বা ডাটা অস্থায়ীভাবে থেকে কমপিউটারের কাজের গতিকে আরও দ্রুততর করে।

ROM (Read Only Memory)-এটা এক ধরণের স্মৃতি যেখান থেকে কোন তথ্যকে শুধু পড়া যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। অবশ্য নতুন প্রোগ্রাম বা তথ্য সংযোগ সুবিধা সম্বলিত রম (PROM), এবং তথ্য সংযোগ ও পরিবর্তন উভয় সুবিধা সম্বলিত রম (EPROM)ও কোন কোন কমপিউটারে থাকতে পারে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেও এর ডাটা বা নির্দেশ মুছে যায় না। কমপিউটারে কন্ট্রোল ইউনিট চালিত করার জন্য এবং নিয়মিত নির্দিষ্ট কোন নির্দেশ পালন করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। রম-এর তথ্য বা প্রোগ্রাম কমপিউটার তৈরীর সময়ই এতে রেকর্ড করে দেয়া হয়।

স্মৃতি ভাণ্ডারের প্রতিটি নির্দিষ্ট অংশের (spot) এক একটি সুনির্দিষ্ট ঠিকানা বা অ্যাড্রেস (address) আছে, যা সংখ্যা দিয়ে (numerically) নামকরণ করা হয়। এই অ্যাড্রেসের সাহায্যে ঐ নির্দিষ্ট স্পটে রক্ষিত ডাটা সহজেই সনাক্ত করা যায়।

ডাটা বা প্রোগ্রাম "সেকেণ্ডারী স্টোরেজ" ডিভাইসেও জমা রাখা যায়। অনেক ধরণের সেকেণ্ডারী স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে ফ্লপি ডিস্ক ও হার্ড ডিস্ক সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ ও হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সিপিইউ-এর ভিতরে বা বাইরে সংযুক্ত থাকে।

ফ্লপি ডিস্কঃ – ছোট গ্রামোফোন রেকর্ডের মত দেখতে নমনীয় এই ডিস্ক সাধারণতঃ পলিয়েস্টার ফিল্মের তৈরী। এর উপর উভয় দিকে চৌম্বকীয় গুণ সম্পন্ন আয়রন অক্সাইড কমপাউণ্ডের একটা পাতলা আচ্ছাদন থাকে। একটা জ্যাকেটের ভিতর এটা স্বচ্ছন্দে দ্রুত গতিতে (প্রতি মিনিটে ৩০০–৪০০ পাক) ঘুরতে পারে। ডিস্ক ড্রাইভের রিড/রাইট হেডের প্রবেশের জন্য কিছু জায়গা খোলা থাকে। ডিস্কের উভয় দিকে অনেকগুলো ট্র্যাক (track) থাকে যাতে রিড/রাইট হেডের সাহায্যে তথ্য ধারণ করা যায় বা পড়া যায়। সোয়া পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের একটা ডিস্কে সাধারণতঃ ৩৬০ K তথ্য ধারণ ক্ষমতা থাকে। 'K' দিয়ে সাধারণত 'Kilo' 'বোঝায় যা দশমিক সংখ্যায় ১০০০। কিন্তু কমপিউটারের স্মৃতিধারণ ক্ষমতা বোঝাতে K দিয়ে 2^{10} বাইটকে বোঝায়। কমপিউটারের স্মৃতির মৌলিক একক হিসাবে, ডিস্কের একটি নির্দিষ্ট স্থানের (spot) চৌম্বকত্ব প্রকাশে বা বৈদ্যুতিক সার্কিটের একটি স্পন্দন বোঝাতে বিট ব্যবহৃত হয়)।

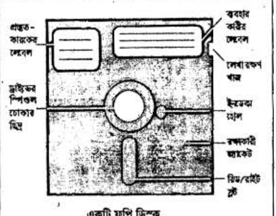

একটি ফ্লপি ডিস্ক

হার্ডডিস্কঃ - এতে অনেকগুলো শক্ত ডিস্ক সম্পূর্ণ ধূলাবিহীন সুরক্ষিত বন্ধ ড্রাইভের মধ্যে একটি দণ্ডে স্থায়ীভাবে পরপর সাজানো থাকে। প্রতিটি ডিস্কের উপরে ও নীচে রিড/রাইট হেড থাকে এবং এরা যে কোন ট্র্যাকে কাজ করতে পারে। ঘূর্ণনের সময় (মিনিটে ১০০০ থেকে ৩৬০০ বার) ডিস্কের এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের একভাগ পাতলা বাতাসের স্তরের উপর এই হেড থাকে। তাই এতে ঘর্ষণজনিত কোন ক্ষয় হয় না। এতে ফ্লপি থেকে অনেক অনেক বেশী তথ্য ধারণ ক্ষমতা থাকে। এর তথ্য ধারণ ক্ষমতা সাধারণতঃ মেগাবাইটে (Mega Byte= Million Byte) প্রকাশ করা হয়। যেমন– ২০ MB একটি হার্ডডিস্কে ২০ মিলিয়ন বাইট তথ্য ধারণ করা যায়। (স্মৃতিধারণ ক্ষমতা বোঝাতে সঠিকভাবে বলতে গেলে MB দিয়ে ১,০২৪ K অর্থাৎ $২^{২০}$ বাইট বা ১০৪৮,৫৭৬ বাইট বোঝায়)। ফ্লপি ডিস্ক বা হার্ড ডিস্কে অধিক পরিমাণে তথ্য স্থায়ীভাবে ধারণ করা যায়। আবার ইচ্ছে মত তা পরিবর্তনও করা যায়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেও ধারণকৃত তথ্যের কোন ক্ষতি হয় না। এই ডিভাইসসমূহ কমপিউটারের স্মৃতিভাণ্ডারকে অনেক অনেক গুণ বাড়িয়েছে। সাধারণতঃ প্রোগ্রাম বা ফাইলসমূহ প্রয়োজন মত ব্যবহার করার জন্য এগুলোতে ধারণ করে রাখা হয়। তবে ব্যবহার বা প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে এদেরকে প্রাথমিক স্মৃতিভাণ্ডারে আনতে হয়।

ফ্লপি ডিস্ক বা হার্ড ডিস্ক ইনপুট/আউটপুটের কাজও করে।

(গ) কন্ট্রোল ইউনিট (CU) ঃ -

কমপিউটারে অন্যান্য সকল অংশের কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দেশিত হয় কন্ট্রোল ইউনিটের সাহায্যে। এই ইউনিট প্রাইমারী স্মৃতিভাণ্ডার থেকে নির্দেশ পেয়ে যথাযথ যন্ত্রাংশে বা Component কে তা পালন করতে আদেশ দেয় এবং তা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটা বিভিন্ন প্রসেসরগুলোর কাজের সমন্বয়ও করে থাকে এবং ডাটা প্রক্রিয়াকরণের পর তা যথাযথ আউটপুট ডিভাইসে স্থানান্তর করে। কন্ট্রোল ইউনিট অন্যান্য প্রান্তীয় বা পেরিফেরাল (Peripheral) ইউনিট যেমন– কীবোর্ড, মাউস, মনিটর ইত্যাদির কাজকর্মও নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) আউটপুট ডিভাইস ঃ –

মাইক্রোপ্রসেসরের প্রক্রিয়াকরণের পর প্রক্রিয়াজাত তথ্যকে মেশিন অথবা মানুষের বোধগম্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে আউটপুট বলা হয়। এ আউটপুট বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। এদেরকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস। আউটপুটের ধরণ হতে পারে বিভিন্ন রকমের সেই সাথে তাদের মাধ্যমগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। এ ডিভাইসগুলোর মধ্যে রয়েছে মনিটর, ডিস্ক, প্রিন্টার ইত্যাদি। মনিটর হচ্ছে তাৎক্ষণিক (temporary) আউটপুট ডিভাইস, কেননা এ আউটপুট ক্ষণস্থায়ী, মনিটরের পর্দায় যেটা দেখা যায়। ডিস্ক হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্টোরেজ ডিভাইস। এতে যে কোন আউটপুট ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ধরে রাখা যায়। প্রয়োজনে যে কোন সময় কমপিউটারের সাহায্যে এ আউটপুট পরিবর্তনও করা যায়। এই পরিবর্তনশীলতার কারণে এ আউটপুটকে Soft Copy বলা হয়। তৃতীয় পর্যায়ের আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে প্রিন্টার। এর মাধ্যমে কোন আউটপুটকে ছাপার অক্ষরে কাগজে ছাপিয়ে নেয়া যায়। ছাপানো আউটপুটের আর কোন পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না বলে এটাকে Hard Copy বলা হয়। এ জাতীয় আউটপুট স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এসব ডিভাইস ছাড়াও আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তিতে সাউণ্ড আউটপুট একটা আকর্ষণীয় ব্যবস্থা। এ কাজটি করে একটা স্পীচ প্রসেসর যা সিপিইউ এর মধ্যে বসানো থাকে। স্পীচ প্রসেসরের প্রক্রিয়াকৃত শব্দ শ্রোতার কাছে পৌঁছে একটা স্পীকারের মাধ্যমে। সুতরাং এ স্পীকারের সাহায্যেও আউটপুট দেয়া যেতে পারে। যেমন কমপিউটার দিয়ে স্বরলিপির সাহায্যে গানের সুর সৃষ্টি করে বিভিন্ন গান বাজানো যেতে পারে। এছাড়া মানুষের গলার স্বরও কমপিউটারকে দিয়ে চিহ্নিত করা বা বুঝানো সম্ভব এবং একইভাবে তাকে দিয়ে বলানোও সম্ভব। ■

কমপিউটার বিষয়ক আপনার যে কোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, আইডিয়া, প্রশ্ন, মতামত বা পুস্তক সমালোচনা লিখে পাঠালে আমরা তা কমপিউটার জগৎ- এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো। ছাপানো লেখার জন্য আপনাকে যথাযথ সম্মানী দেয়া হবে। □